The Faculty Journal of Arts, Rajshahi University
Special Volume-6 on **Issues Around Pedagogy: Teaching-Learning Strategies in Arts & Humanities for the 21st Century, 3rd International Conference**, 25-26 June 2025, ISSN 1813-0402

The Role of the Monarchy in Establishing the Kheyal Song Style: The Indian Subcontinent

Dr. Sonia Sharmin Khan
Lecturer, Department of Music, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
Rajshahi University
Special Volume-6
ISSN: 1813-0402 (Print)

Received : 04 March 2025
Received in revised: 28 April 2025
Accepted: 16 March 2025
Published: 25 October 2025

Keywords:
Court Music, North Indian Classical Music, Kheyal pattern

ABSTRACT

In the Indian subcontinent, great strides were made in the field of music under the patronage of various kingdoms. Especially from the beginning of the middle ages to the British rule, there are examples of special contribution in the field of music of the kings and landlords of the Delhi court and its adjoining regions as patron. It is to note that Alauddin Khilji made special contribution in the field of music during the Sultan rule in the middle ages. At that time a favorable musical circle was formed in this court. Not only was that, Amir Khasru, one of the great musician at that time, engaged in his court as a court musician. He revolutionized the field of music at that time. He created many more lyric style, many more Ragas and Instruments. Though notable at that time, the lyric style did not have the status of a popular genre. Many people think that time it was not `Kheyal' but `Kawali' or `kabali' that was popular which is very similar to kheyal song style. However there are differences of option. It is to be noted that Sultan Alauddin Khilji gave generous patronage to the all creations of Amir Khasru. Among then, it can be clearly said that Alauddin khilji is ininvolved in the estanlishment of Kheyal. Later in the fifteenth century, Sultan hussain Shah Sharki, the king of Gowalior, gave a unique feature to the style of Kheyal. He was a ruler and at the same time a musician. In the history of music there are many emperors who was simultaneously rulers and musicians. Sultan Hussain Shah Sharki is one of them. Due to his diligent efforts, the style of kheyal lyric ws greatly improved. At that time, however, the idea was not as widespread in the Gowalior region as it was in the court of of Delhi. Kheyal style was established in the court of Delhi mainly during the reign of Mughal rular Mhammad Shah. Mohammad shah was a generous patron of music and was himself expert in Music. At that time Niyamat Khan Sadarang of Tansen dynasty was one of the musicians in the court of Mohammad Shah. Sadarang, with his talent, gave a unique facility of Kheyal. On the other hand, Mohammad Shah's sincere attention patronage towards Kheyal was also a big step in the establishment of this style. At the same time, this research will attempt to explore how much the attention to music of the Mughal rulers preceding Mohammad Shah contributed to the development of Kheyal.

ভূমিকা

উচ্চাঙ্গ সংগীতের অন্যতম দুটি ধারা হলো: খেয়াল ও ধ্রুপদ। তন্মধ্যে খেয়াল শৈলীটি মধ্যযুগে তথা সুলতানী শাসনামলে একটি রূপ পরিগ্রহ করে। সময়ের পরিক্রমায় ইংরেজ শাসন পূর্ববর্তী সময়ে এই ধারাটি যথেষ্ট জনপ্রিয়তাও লাভ করে বর্তমান সময় পর্যন্ত একটি ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চলেছে। এই গায়নশৈলীটি বিশেষ রস ও গুণসম্পন্ন বলেই এর ঔদার্য নিয়ে সংগীত জগতে টিকে আছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তথাপি এ গানের প্রচলনে এবং বিভিন্ন সময়ে ভারতীয় উপমহাদেশের শাসক হিসেবে যে শাসকগণ ছিলেন তাঁদের অনেকেই খেয়াল গানের ধারাবাহিকতা রক্ষার ক্ষেত্রে অবদান রেখেছিলেন। তারা খেয়াল গীতরীতিটি প্রচলনের ক্ষেত্রে মূলত পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। সংগীতের প্রসার ও উন্নতিকল্পে যদি তারা পৃষ্ঠপোষক হিসেবে এগিয়ে না আসতেন তাহলে হয়তো খেয়ালশৈলীটি বর্তমান সময় পর্যন্ত এর ঔদার্য ধরে রাখতে পারতো না। একই সাথে বলতে হয়, শাসকদের মধ্যে অনেকেই যেমন সংগীতের উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তেমনি ছিলেন সংগীতের বিশেষ অনুরাগীও। তাঁরা খেয়াল গানের গভীরতা ও রসকে উপলোব্ধি করেছিলেন বলেই এই গানটি তার সুকুমার বৈশিষ্ট্য নিয়ে একটি বিশেষ মর্যাদা প্রাপ্ত হয়েছে তা স্পষ্ট করে বলা যায়।

ক. খেয়ালশৈলীর পরিচিতি

খেয়াল অর্থ কল্পনা, খুশি, মনোযোগ, বাসনা ইত্যাদি। এটি একটি আরবী শব্দ। অনেকে ফার্সী শব্দ হিসেবেও উল্লেখ করে থাকেন। 'খয়াল্' শব্দটি থেকে খেয়াল এসেছে বলে মনে করা হয়। আভিধানিক অর্থের সাথে সংগতি রেখে সংগীতের একটি গীতরীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার ক্ষেত্রে এর একটি যোগসূত্রিতা আছে। ভারতীয় সংগীত রাগের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে আর এই রাগ গাইবার তথা রাগরূপ ফুটিয়ে তোলার একটি বৃহৎ পরিসর হিসেবে খেয়ালশৈলী একটি স্বাচ্ছন্দ সৃষ্টি করতে সক্ষম। একারণে স্বাচ্ছন্দেই এ শৈলীতে রাগের চলন ও রূপ খেয়াল মতোই ফুটিয়ে তোলা যায়। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই খেয়ালের এইরূপ নামকরণ হয়েছে মনে করা হলেও এর সৃষ্টির পেছনে যথেষ্ট কারন থাকাটাই স্বাভাবিক। কেননা ভারতীয় সংগীতের অন্যতম একটি প্রধান একটি গীতশৈলী হলো খেয়াল। খেয়ালগীত সৃষ্টির পূর্বে ভারতীয় উপমহাদেশে অনেক গীতি প্রকারই রূপ পরিগ্রহ করেছে। যেমন: একেবারে প্রাচীন সময়ে সামগান থেকে শুরু করে প্রবন্ধ গান এবং পরবর্তীতে কাওয়ালী প্রভৃতি। কিন্তু কোন গীতশৈলীই তার ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে সক্ষম হয়নি। তবে খেয়াল গান বা গীতশৈলী তার ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চলেছে। এটি কাব্যগুণসম্পন্ন ও কাঠামোগত দিক থেকে উচ্চ পর্যায়ের বলেই হয়তো বর্তমান সময় পর্যন্ত এর ঔদার্য নিয়ে সংগীতাঙ্গনে টিকে আছে । সংগীতের অন্যতম এই প্রধান শৈলীটি সংগীতজ্ঞ আমীর খসরুর সময় একটি রূপ পরিগ্রহ করে বলে অনেকে মনে করে থাকেন। অর্থাৎ এর সৃষ্টি হয় আমীর খসরুর সময়। তবে এ নিয়ে মতান্তর ও মত পার্থক্যও বিদ্যমান। কেননা খেয়ালশৈলীর উৎপত্তি নিয়ে যে সকল মতবাদ পাওয়া যায় তা থেকে আমীর খসরুর সময় খেয়ালের সৃষ্টি হয়েছে সে বিষয়ে একেবারে দৃঢ় অবস্থান তৈরী করা যায় না। খেয়ালের উৎপত্তি নিয়ে যে সকল মতবাদ পাওয়া যায় সেগুলো হলো:

- আলি জাতীয় প্রবন্ধের অন্তর্গত কৈবাড় নামক প্রবন্ধ থেকে খেয়ালে উদ্ভূত হয়েছে।[১]
- খেয়ালের উৎসমুখে রয়েছে একতালী ও রাসক প্রবন্ধ।[২]
- শার্ঙ্গদেব তাঁর সংগীত রত্নাকরে যে আক্ষেপ্তিকার বর্ণনা দিয়েছেনতা থেকে খেয়ালের উৎপত্তি।[৩]
- সুরেলা শব্দ গঠন ও অলঙ্করণ প্রবণতার মিশ্রণের মধ্য দিয়ে খেয়াল এসেছে।[৪]
- চটুকল নামক সংকীর্ণ জাতীয় প্রবন্ধ থেকে খেয়াল এসেছে।[৫]
- সাধারণী গীতির কাঠামো থেকে খেয়ালের ক্রমবিকাশ ঘটেছে।[৬]
- কাওয়ালী বা কাব্বালী গানের ক্রমবিকাশের মধ্যদিয়ে খেয়াল এসেছে।[৭]

প্রাথমিকভাবে প্রাপ্ত মতবাদের স্বাপেক্ষে খেয়ালকে প্রবন্ধ গানের একটি প্রকার হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। প্রবন্ধ গানগুলো মধ্যযুগে সুলতানী আমলে সৃষ্ট প্রকার নয়। প্রাচীন বৈদিকোত্তর যুগের শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এই প্রকারগুলো। সহজেই অনুমান করা যায় প্রবন্ধ গানের সৃষ্টিকাল তারও অনেক পূর্বে। খেয়াল গানের সামগ্রিক অবয়বের সাথে তার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য অনেকাংশেই সংগীত গবেষকদের ভাবতে উদ্বুদ্ধ করে থাকতে পারে যে, প্রবন্ধ গান রূপান্তরিত হয়ে খেয়াল পদবাচ্যে পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে 'কৈবাড়' প্রবন্ধের রূপান্তরিত যে ধাপগুলো দেখতে পাওয়া যায় তা এই ধারণাকে আরও বেশি গ্রহণযোগ্যতার দিকে ধাবিত করে। কেননা আলি জাতীয় প্রবন্ধের অন্তর্গত 'কৈবাড়' নামক প্রবন্ধটির শাব্দিক পরিবর্তনটি খেয়ালের সংশ্লেষের একটি চিত্র উপস্থাপন করে তা সহজেই অনুমান করা যায়। এর শাব্দিক পরিবর্তন নিম্নরূপ:

করবাট > কৈবাট > কৈবাড় > কায়বল > খেয়াল।

আবার অন্য পক্ষে একতালী ও রাসক প্রবন্ধকেও খেয়ালের সৃষ্টির উৎস বলা হয়েছে। কিন্তু উল্লেখ্য যে, এই প্রবন্ধগুলো খেয়াল গানের সামগ্রী বিচারে সম্পূর্ণ নয়। খেয়ালের যে সংখ্যক ধাতু ও অঙ্গ রয়েছে, 'কৈবাড় প্রবন্ধ', 'একতালী' বা 'রাসক' প্রবন্ধে তা অনুপস্থিত। এসকল সীমাবদ্ধতার কারনে প্রবন্ধগানকে খেয়ালের উৎপত্তির কারণ হিসেবে মানা হয় না। শুধু তাই নয়, প্রবন্ধ গানের নানা সীমাবদ্ধতা ও খেয়ালের বর্তমান রূপের সাথে বৈসাদৃশ্য প্রকট হওয়ায় এ মতবাদগুলোকে খেয়ালের উৎপত্তির কারন হিসেবে স্বীকৃতি পায় না। শার্ঙ্গদেব যে আক্ষেপ্তিকার উদাহরণ দিয়েছেন সে ক্ষেত্রেও এই সীমাবদ্ধতা অবলোকন করা যায়। শেষোক্ত মতবাদের অন্তর্গত দুটি মতবাদ অবশ্য অনেকাংশেই খেয়াল সৃষ্টির ক্ষেত্রে যুক্তিযুক্ত বলে বিবেচিত হতে পারে।

খেয়াল অর্থ কল্পনা বা মনের ভাব, কল্পনা বা খুশি ইত্যাদি। চতুর্থ মতবাদের সাথে এর একটি সাজুস্য পূর্ণ সেতু বন্ধন রচিত হয়েছে বলা যায়। 'সুরেলা শব্দ গঠন ও অলঙ্করণ প্রবণতার মিশ্রণের মধ্য দিয়ে খেয়াল এসেছে' এই মতটি খেয়ালের উৎপত্তির ক্ষেত্রে একটি যথোপযুক্ত মতবাদ হিসেবে বিবেচিত হয় তা বললে অত্যুক্তি হয় না। অন্যদিকে 'কাওয়ালী' বা 'কববালি' গানটি খেয়ালের সৃষ্টির সংশ্লেষের একটি পর্যায় হিসেবে বিবেচনা করা হলে তা অনেক ক্ষেত্রেই একটি গ্রহণযোগ্য মতবাদ হিসেবে বিবেচিত হতে সক্ষম। খেয়াল সৃষ্টির ক্ষেত্রে মতবাদগুলো যেভাবেই বিচার্য হোক না ত্রয়োদশ শতাব্দির পূর্বে এই গানের উত্তরোণ ঘটেনি বা নির্দিষ্ট কোন রূপ পরিগ্রহ করেনি। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের আলোকে এটিও প্রতীয়মান হয় যে আঠারশ ও ঊনবিংশ শতকে এটি জনপ্রিয়তার শীর্ষে আসীন হয় এবং রাগ সংগীতের একটি অন্যতম শৈলী হিসেবে মর্যাদা প্রাপ্ত হয়।

খ. খেয়ালশৈলীর প্রবর্তনে আলাউদ্দিন খিলজীর শাসনামল

মধ্যযুগে সুলতানী শাসনামলের সূচনা লাভের মধ্যদিয়ে ভারতীয় সংগীতের জগতে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে। কেননা মধ্যযুগের পূর্বে সংগীত সামাজিকভাবে প্রচলিত ছিল অথবা মন্দিরকে আশ্রয় করে গাওয়া হতো। এই সামাজিক গান বা মন্দিরাশ্রিত গানগুলোর স্বীকৃতি পাওয়ার সুযোগও ঘটেনি সেভাবে । মধ্যযুগে সুলতানী শাসনামলে এসে দেখা যায়, সে সময় অনেক সুলতানদের রাজদরবারে সংগীত পরিবেশিত হওয়ার একটি সুযোগ তৈরী হয়েছিল। বিশেষ করে আলাউদ্দিন খিলজীর শাসনামলে সংগীত রাজদরবারে বেশ সমাদৃত হয়েছিল। অর্থাৎ মধ্যযুগের এই পর্যায়ে সংগীত মন্দিরাশ্রিত হয়ে বা সাধারণের মধ্যে আর সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং দরবারের অংশ হিসেবে স্থান করে নেয়। জানা যায় আলাউদ্দিন খিলজী সংগীত খুব পছন্দ করতেন এবং সে সময় সংগীতের বিশেষ পৃষ্টপোষকতা করেছিলেন। আলাউদ্দিন খিলজী একজন রাজন্যবর্গ হিসেবে সংগীতের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন বলেই সুলতানী আমলে সংগীতচর্চার একটি অনুকূল পরিবেশ গড়ে উঠেছিল বললে অত্যুক্তি হয় না। তবে সে সময় সংগীতের বিশেষ উন্নতি হয়েছিল আরও একটি বিশেষ কারনে। আর তা হলো সে সময় আলাউদ্দিন খিলজীর রাজ দরবারে সভাসদ হিসেবে ছিলেন আমীর খসরু ও সমসাময়িক আরও অনেক গুনী সংগীতজ্ঞ (গোপাল নায়ক, বৈজু বাওড়া প্রমুখ) ছিলেন। আমীর খসরু ছিলেন সংগীতের একজন অসামান্য প্রতিভার অধিকারী। তিনি সংগীতের প্রভূত উন্নতি সাধনে যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছিলেন। সংগীতে তাঁর সৃষ্টি ও অবদানের দিকে যদি দৃষ্টিপাত করা যায় তবে দেখতে পাওয়া যায়:

- তিনি সংগীতের ব্যাকরণবিধিসহ নানাবিধ আলোচনা লিপিবদ্ধ করে প্রায় ৯৯টি বই রচনা করেন।
- নতুন নতুন রাগের সৃষ্টি করেন।
- বাদ্যযন্ত্র সৃষ্টি করেন, অনেক বাদ্যযন্ত্রের আধুনিকায়নে অবদান রাখেন।
- মোকাম পদ্ধতির চালু করেন যা বর্তমান ঠাট পদ্ধতির অনুরূপ রাগের তালিকা প্রণয়নের একটি উপায় স্বরূপ ব্যবহৃত হতো।
- পারস্য সংগীতের সাথে ভারতীয় মেল বন্ধন রচনা করেন এবং পারস্য সংগীত প্রভাবিত ভারতীয় সংগীতের একটি রূপের পরিচয় করিয়ে দেন তৎকালীন শ্রোতা সমাজের কাছে।
- নতুন গীতশৈলীর উদ্ভাবন ঘটান। যেমন: কাওয়ালী

আমীর খসরু কাওয়ালী গানের প্রচলনে মধ্য দিয়ে যে শুধু নতুন গীতি প্রকার রচনা করেছেন তা নয়, সে সময় কাওয়ালী গানের উত্তরণের সাথে সাথে খেয়াল গানের সৃষ্টি প্রক্রিয়ার একটি ক্ষেত্র তৈরী হয়েছিল বলা যায়। কেননা খেয়ালের উৎপত্তির মতবাদ থেকে একটি বিশেষ মতবাদের পরিচয় পাওয়া যায় যে 'কাওয়ালী গান থেকে খেয়ালের উৎপত্তি।' এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, তৎকালীন প্রচলিত কাওয়ালী গান ও বর্তমানে রচিত কাওয়ালী গানের বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে আমীর খসরু রচিত কাওয়ালী গানের আদলের সাথে বর্তমানে প্রচলিত খেয়ালের রীতির একটি সাদৃশ্যপূর্ণ রূপ আছে। তাত্ত্বিকগণ সেই বিষয়টির উপর ভিত্তি করে আমীর খসরুকে খেয়াল গানের প্রবক্তা হিসেবেও মতামত ব্যক্ত করে থাকেন। সে সময় কাওয়ালী গাইয়দের 'কওয়ল বচ্চে' বলা হতো। এই কওয়ল থেকে 'কৌল' নামক একটি গীতিরীতির উদ্ভব হয়েছিল। আলোচ্য এই 'কৌল' 'খেয়াল গানের বিবর্তনের কোন একটি পর্যায় বলেই অনেকে মনে করে থাকেন। তাই খেয়ালরীতি কাওয়ালী গান থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে সেই বিষয়টিকেও অনেক তাত্ত্বিক স্বীকারও করে নেন। এ প্রসঙ্গে জানা যায়:

> খয়াল্ গানে 'ফিক্রাবন্দ্' নামক এক প্রকার আলংকারিক বিস্তার আবশ্যিকভাবে প্রয়োগ করা হয় যা ধর্মীয় প্রকৃতির কৌল বা কওয়ালী গানে প্রাচীনকাল থেকেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। দ্বিতীয়তঃ গানের বিষয়বস্তু ছিল প্রেম ও বিরহ [অবুল্ ফজ্ল্ এবং ফকীর-উল্লাহ্র বিবরণ থেকে অন্ততঃ তাই মনে হয়েছে।] কখনো কখনো প্রকৃতি-বর্ণনা ও নিজামুদ্দিন ঔলিয়ার [আমীর খসরুর গুরু] গুণকথনও বর্ণিত হতে দেখা যায়। আমাদের এখানে একটি কথা জেনে রাখা উচিৎ যে, আমীর খুস্রৌর খয়ালে আধুনিককালের খেয়ালে ব্যবহার্য তান-সর্গম ছিল না। কওল-বচ্চে ঘরানার বড়ে মুহম্মদ খাঁ ১৮২৪-২৫ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম ফিক্রাবন্দের বিস্তার থেকে গীতিকবিতার শব্দগুলি বর্জন করে নতুন বিস্তার বা তান [তান শব্দের অর্থ বিস্তার] সৃষ্টি করেন। খুস্রৌর খয়াল্ ছিল মধ্য ও দ্রুত লয় বিশিষ্ট।[৮]

উপরোক্ত মন্তব্যে স্পষ্টভাবে আমীর খসরুকে খেয়াল গানের প্রবক্তা মনে করা হলেও কাওয়ালী গান থেকে খেয়ালের উৎপত্তি হয়েছে সে বিষয়টি নিয়ে মতভেদ রয়েছে। যদিও কাওয়ালী গানের প্রচলনের ক্ষেত্রে আমীর খসরুর অবদান নিয়ে মতভেদ নেই। একই সাথে আমীর খসরু আলাউদ্দিন খিলজীর পৃষ্টপোষকতায় সংগীতের অভাবনীয় উন্নতিকল্পে অবদান রেখেছিলেন সে বিষয়ে ঐতিহাসিকগণ সমমত প্রকাশ করে থাকেন। একজন প্রতিপোষক হিসেবে উদারতা ছিলো বলেই সংগীতের এই ক্ষেত্রটি বিস্তৃত হয়েছে আলাউদ্দিন খিলজীর শাসনামলে তা সহজেই অনুমান করা যায়। আলাউদ্দিন খিলজী খেয়ালের একজন গুনগ্রাহী ছিলেন এবং এই গান দরবারে প্রচলনের ক্ষেত্রে তাঁর ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

গ. সম্রাট হুসেন শাহ্ শরকীর সময়ে খেয়ালশৈলী

আমীর খসরুর পর পরবর্তী প্রায় দু'শো বছর খেয়ালের প্রচলন নিয়ে কোন উল্লেখযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। তবে আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দির মাঝামাঝি জৌনপুরের সুলতান হুসেন শাহ্ শর্কীর সময় (১৫৩৮-১৫৯৯) ভারতীয় উপমহাদেশে খেয়ালের চর্চার একটি বৃহৎ পরিসরের দেখা মেলে। ঐতিহাসিকগণের মধ্যে অনেকেই তাঁকে খেয়াল গানের প্রবক্তা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে থাকেন। এ সম্পর্কে ক্যাপ্টেন উইলিয়ার্ড তাঁর 'A treaties on the Music of Hindoostan' গ্রন্থে সুলতান হুসেন শাহ্ শর্কীকেই খেয়ালের প্রবক্তা বলে দাবী করেছেন। তিনি বলেন, 'Sooltan Hoosyan Shah Sharque of Jaunpur is the innovator of this class of song.'[৯] যদিও এই তথ্যটির পক্ষে এবং বিপক্ষে যুক্তিসঙ্গত অনেক উক্তির অবতারনা হয়েছে। তাই ধরে নেয়া যেতে পারে হুসেন শাহ্ শর্কী খেয়াল গানের প্রবক্তা নন। তবে খেয়াল গানের প্রতিপোষক হিসেবে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। বলা যেতে পারে তাঁর সময় বিশেষভাবে খেয়াল সমাদৃত হয়েছে। তিনি নিজেই একজন শাসক ছিলেন আবার একই সাথে সংগীতের সাধকও ছিলেন। তাই তাঁর খেয়ালের প্রতি আসক্তি সে সময় খেয়াল গানের উন্নতির ক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল তা অনায়াসেই বলা যায়। একজন শাসকের দরবারে কোন গানের পরিবেশনা স্বীকৃতি পাবে এবং কোন গানের চর্চা হবে তা অনাকাংশেই শাসকের পছন্দের উপর নির্ভর করে। সম্রাট হুসেন শাহ্ শর্কী খেয়ালের রস ও গুণ সম্পর্কে একজন সুযোগ্য সংগীতের সাধক হিসেবে ওয়াকিবহাল ছিলেন। তাই তাঁর দরবারে এই গানটি একটি আলাদা মর্যাদা লাভ করে। পরবর্তীতে এই ধারাবাহিতাকে ধরে রাখতে দেখা যায় অনেক শাসকের দরবারেই।

ঘ. মুঘল সম্রাটদের দরবারে খেয়ালের চর্চা

ভারতীয় সংগীত আদি অবস্থা থেকে বিভিন্ন গঠন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মধ্যযুগে পদার্পন করে। এ সময় সংগীতকে একটি প্রথাবদ্ধ রূপ পরিগ্রহ করতে দেখা যায়। আর সংগীতের এই প্রথাবদ্ধ রূপের চর্চা শুরু হতে দেখা যায় মূলত মধ্যযুগে বিভিন্ন রাজদরবারে, দরবারী পৃষ্ঠপোষকতায়। প্রকৃতপক্ষে দরবারী পৃষ্ঠপোষকতায় সংগীত চর্চার সূচনা হয়েছিল সুলতানী শাসনামল থেকে। পরবর্তীতে মুঘল শাসনামলেও দরবারী পৃষ্ঠপোষকতায় সংগীত চর্চা অব্যাহত ছিল। এরই ধারাবাহিকতায় সম্রাট বাবর থেকে শুরু করে হুমায়ুন ও পরবর্তী প্রায় সকল মুঘল শাসকদের দরবারে সংগীত প্রচলনের ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে খেয়ালের চর্চা সব মুঘল সম্রাটদের দরবারে হয়েছিল বলে জানা যায় না।

সম্রাট আকবর

সম্রাট আকবরের যুগে সংগীতের সবচেয়ে বেশি উন্নতি ঘটতে দেখা যায়। ঐতিহাসিকগণ সম্রাট আকবরের যুগকে তাই সংগীতের 'স্বর্ণযুগ' হিসেবে অভিহিত করেছেন। কেননা সম্রাট আকবরের দরবারে অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন সংগীতজ্ঞ তানসেনের আবির্ভাব ঘটেছিল। ঐতিহাসিক আবুল ফজল 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে বিগত ছয়শত বছরে তানসেনের ন্যায় এমন প্রতিভাধর সংগীতজ্ঞের আগমন ঘটেনি। তবে সেটিই আকবরের যুগে সংগীতের উত্থানের ক্ষেত্রে একটি মাত্র কারণ নয়। এক্ষেত্রে যৌক্তিকভাবে বলা যায় সুদীর্ঘ মুঘল শাসনের ইতিহাসে সম্রাট আকবর অন্যতম একজন শাসক ছিলেন যিনি সংগীতের প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। ঐতিহাসিক আবুল ফজল বলেছেন: 'সম্রাট আকবর অত্যন্ত সংগীতপিপাসু ও সংগীত শিল্পী মাত্রেরই পৃষ্টপোষক।'[১০] তাই দেখা যায় সম্রাট আকবর দিল্লীর দরবারে সংগীতচর্চার ক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন। সে সময় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এমনকি ভারত বহির্ভূত বিভিন্ন স্থান থেকে দিল্লীর দরবারে গুণী সংগীতজ্ঞদের আগমন ঘটেছিল। ঐতিহাসিক আবুল ফজল আকবরের দরবারে শীর্ষস্থানীয় সংগীতজ্ঞদের (গায়ক ও বাদ্যযন্ত্রী) একটি তালিকাও প্রণয়ন করেছেন। তাদের মধ্যে ছত্রিশ জন মতান্তরে আটত্রিশ জন উচ্চমানের শিল্পীর পরিচয় পাওয়া যায়। আরও জানা যায় সম্রাট আকবরের দরবারে তানসেনসহ কতিপয় বিশিষ্ট সংগীতগুণীর আগমন ঘটেছিল তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন মানওয়ারের রাজা বাজবাহাদুর। তিনি একাধারে গায়ক, গীতিকার, সুরস্রষ্টা হিসেবে বিশেষ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। বাজবাহাদুর মূলত ধ্রুপদ গান করতেন। তবে এ সময় দরবারে খেয়ালরীতির চর্চা হয়েছিল কিনা সে বিষয়ে স্পষ্ট কোন তথ্য পাওয়া যায় না। আকবরের সময়ে আরও একজন বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ স্বামী হরিদাসের নাম জানা যায়। যদিও তিনি দিল্লীর দরবারভুক্ত সভাসদ হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন না। স্বামী হরিদাসের অনেক শিষ্যের পরিচয় পাওয়া যায় যারা দরবারে সংগীত পরিবেশন করতেন। এরা প্রায় সবাই ধ্রুপদ পরিবেশন করতেন বলেই জানা যায়। বিশেষ করে তানসেন বংশীয় যারা, তারা সে সময়ে ধ্রুপদ ছাড়া অন্য কোন গীতরীতি পরিবেশনাকে অমর্যাদার মনে করতেন। বিধায় সে সময় দরবাওে খেয়ালের চর্চা হওয়ার কোন সুযোগ ঘটেনি।

সম্রাট জাহাঙ্গীর

দরবারী সংগীতের ধারা সমুন্নত রেখেছিলেন সম্রাট আকবর পরবর্তী সম্রাট জাহাঙ্গীর (১৬০৫-১৬২৭ খ্রি:)। জানা যায়, সম্রাট জাহাঙ্গীর শাসনভার গ্রহণের পূর্বেই সুর সম্রাট তানসেন মৃত্যুবরণ করেছিলেন তবে তানসেনের বংশধর তানসেনপুত্র সুরত সেন, তরঙ্গ সেন, শরত সেন ও বিলাস খাঁ জাহাঙ্গীরের দরবারে সভাসদ হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে শুধুমাত্র তানসেন পুত্র বিলাস খাঁ-ই মুঘল রাজদরবারে পিতার স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন। তানসেন বংশ ব্যতীত যে সকল

সভাসদের কথা জানা যায় তাদের মধ্যে একজন হলেন মীর্জা জুলকারনাইন (১৫৯৩-১৬৫৬ খ্রি:) তিনি ধ্রুপদ রচনা করতেন এবং স্বরোচিত ধ্রুপদই গাইতেন। এছাড়াও ছত্তর খাঁ, জাহাঙ্গীর দাদ, লাল খাঁ, যুর্‌রম দাদ প্রমুখ গুণী সংগীতজ্ঞও সভাসদ হিসেবে ছিলেন। লাল খাঁর দুই পুত্র খুশহাল খাঁ ও বিশ্রাম খাঁ ধ্রুপদের চর্চায় বিশেষ সুনাম অর্জন করেছেন। সে সময় এদের সকলেই দরবারে ধ্রুপদ চর্চা করতেন বলে জানা যায়। উল্লেখ্য যে, জাহাঙ্গীর পত্নী সম্রাজ্ঞী নূরজাহানও সংগীতের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। কথিত আছে অন্দরমহলে নারীদের উৎসাহিত করার পাশাপাশি সংগীত আসরেরও ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগী হয়েছিলেন সম্রাজ্ঞী নূরজাহান।

সম্রাট শাহ্‌জাহান

দরবারী সংগীতচর্চার ধারাবাহিকতা অব্যাহত ছিল সম্রাট শাহ্‌জাহান এর রাজত্বকালেও। ফকিরুল্লাহ রচিত 'রাগদর্পন' গ্রন্থে শাহ্‌জাহানের রাজত্বকাল ও সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনামলে সংগীত চর্চার সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। 'রাগদর্পন' গ্রন্থ থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুসারে বলা যায়, সে সময় সংগীতানুষ্ঠান নিয়মিতভাবে আয়োজনের প্রচলন ছিল, নারী পুরুষ উভয়েরই সংগীতে অংশ গ্রহণের সুযোগ ছিল, বাদ্যযন্ত্রীদেরও বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হত। এছাড়া 'রাগ দর্পণ' গ্রন্থের আলোকে তানসেন বংশীয় সুযোগ্য বর্শীয়ান সংগীতজ্ঞদের পরিচয়ও যাঁরা সম্রাট শাহ্‌জাহানের দরবারে নিযুক্ত ছিলেন। শাহ্‌জাহানের দরবারে যারা সভাসদ হিসেবে ছিলেন তাঁরা হলেন 'লাল খাঁ, খুশহাল খাঁ, বিশ্রাম খাঁ, রঙ্গ খাঁ, জগন্নাথ কবিরায়, শেখ বহাউদ্দিন, শেখ মহম্মদ, মিঞা ডালু ঢাঢ়ী, সবাৎ খাঁ ঢাঢ়ী প্রমুখ। 'বাদ্যযন্ত্রী' হিসেবে যাদের নাম জানা যায় তাঁরা হলেন- কির্‌পা (মৃদঙ্গ), ফিরোজ ধাড়ী (পাখওয়াজী), সুখর সেন কলাবন্ত (রবারী), আমন উল্লাহ (পাখওয়াজী), শৌকী (তম্বুরা বাদক), শেখ বাহাউদ্দিন যিনি যন্ত্র ও কণ্ঠ সংগীত উভয় বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন।' সম্রাট শাহ্‌জাহানের শাসনকালে আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো, ধ্রুপদের পাশাপাশি দরবারে অন্যান্য গায়নশৈলীর অনুপ্রবেশ ঘটে। সুলতানী শাসনামল থেকে মুঘল শাসনামলে সম্রাট শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালের পূর্ব পর্যন্ত দরবারী সংগীতে ধ্রুপদেরই একছত্র আধিপত্য ছিল। তবে সময়ের সাথে সাথে ধ্রুপদরীতির চর্চা অনেকটাই হ্রাস পেতে শুরু করে। দরবারী ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখতে যে সকল গায়নশৈলীকে কখনও মর্যাদা দেওয়া হতো না সে গায়ন শৈলীগুলো দরবারে স্থান করে নেয়। তন্মধ্যে লোক আঙ্গিকের গানের কথাও জানা যায় যা দরবারী সংগীতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। আলাউদ্দিন খিলজীর সময় আমীর খসরু কাওয়ালী গানের প্রচলনে উদ্যোগী হয়েছিলেন কিন্তু তা দরবারী সংগীত প্রচলনের প্রথম পর্যায়ে দরবারে স্থান পায়নি সেই কাওয়ালী গানের উত্থান ঘটতে দেখা যায় সম্রাট শাহ্‌জাহানের দরবারে। অন্যদিকে ক্ল্যাসিক্যাল ধারার অংশ হিসেবে ধ্রুপদের পাশাপাশি খেয়াল রীতির উত্তরণের পথও সুগম হয়। দরবারী মহলে পূর্বে খেয়াল গান যে অপ্রচলিত ছিল, তা নয়। তবে দরবারী সংগীতের মর্যাদায় খেয়াল গান এর প্রচলন শুরু হয় সম্রাট শাহ্‌জাহানের সময় থেকে। তাই সম্রাট শাহ্‌জাহানের সময়ে দরবারী সংগীতে ধ্রুপদসহ অন্যান্য গীতি শৈলী অনুপ্রবেশকে সংগীতের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলে বিবেচনা করা যেতে পারে।[১১]

সম্রাট আওরঙ্গজেব

প্রায় অর্ধশত বছর বিস্তৃত আওরঙ্গজেব এর শাসনামলে সংগীতে উল্লেখযোগ্য কোন উন্নতি ঘটতে দেখা যায় না। তবে সম্রাট শাহ্‌জাহানের দরবারের যারা সভাসদ ছিলেন তাঁদের অনেককে দেখা যায় আওরঙ্গজেবের দরবারে। এছাড়া আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে সংগীতের দুইটি গ্রন্থ রচিত হয়, একটি হলো ফকিরুল্লাহ্‌ রচিত 'রাগদর্পন' অপরটি মীর্জা খাঁ ইবনে ফখরুদ্দিন মুহম্মদ রচিত 'তুহ্‌ফাতুল হিন্দ্‌'। এই গ্রন্থ দুইটিতেও পূর্ববর্তী শাসনামলে সংগীতের চর্চার বিবরণসহ আওরঙ্গজেবের শাসনামলে সংগীতচর্চার বেশকিছু তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। এই তথ্য অনুসারে জানা যায় পূর্ববর্তী শাসনামলের অধিক পরিমাণে সংগীতচর্চা হয়েছিল সে তুলনায় আরওঙ্গজেবের শাসনামলে তেমন একটা চর্চা হয়নি। জানা যায় সম্রাট তাঁর শাসন ভার গ্রহণের প্রথম দশ বছর দরবারী সংগীতের সমর্থন করেছেন। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি দরবারে সংগীত প্রচলনে সম্মত ছিলেন না। ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে আওরঙ্গজেব এক ফরমান জারি করেন: "সংগীতজ্ঞরা দরবারে নিয়মিত ভাবে এসে তাদের অর্থাদি যেন নিয়ে যান, তবে দরবারে এখন থেকে আর গান বাজনা হবে না"।[১২] তাই বলা যায় সে সময়ে খেয়াল চর্চা ও প্রচলনের ক্ষেত্রে সম্রাট আওরঙ্গজেবের উল্লেখযোগ্য কোন ভূমিকা নেই।

সম্রাট বাহাদুর শাহ্‌ ও জান্দাহার শাহ্‌

মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর যাঁরা দিল্লীর সিংহাসনে ক্ষণস্থায়ী শাসকদের মাঝে একজন ছিলেন বাহাদুর শাহ্‌ (১৭০৭-১৭১২ খ্রি:)। সংগীতের প্রতি এই শাসকের ভালবাসা ও উদারতার দৃষ্টান্ত মেলে। সম্রাট আওরঙ্গজেব দীর্ঘদিন যে দরবারী সংগীত প্রথাকে এক প্রকার অবরুদ্ধ করে রেখেছিলেন বাহাদুর শাহ্‌ সেই প্রথা পুনরায় প্রচলনে উদ্যোগী হন। ম.ন. মুস্তফার বিবরণ থেকে জানা যায়:

> কথিত আছে যে তিনি (বাহাদুর শাহ্‌) সারারাত জাগ্রত এবং পরদিন মধ্যাহ্ন পর্যন্ত নিদ্রিত থাকতেন। জেগে থাকার সময়ে প্রায় গান শুনে সময় কাটাতেন। তিনি সঙ্গীতের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় চাকুরীচ্যুত সঙ্গীতজ্ঞরা আবার ভীড় জমালে তাদের অনেককে আবার চাকুরীতে বহাল করা হয়।[১৩]

বাহাদুর শাহ্ এর দরবারে যারা পুনরায় সভাসদ হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে তানসেন বংশীয় নির্মল খাঁর পুত্র নিয়ামত খাঁ (১৬৭০-১৭৪৮ খ্রি:) ছিলেন উল্লেখযোগ্য। বাহাদুর শাহ্ মাত্র পাঁচ বছর দিল্লীর সম্রাট হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র জান্দাহার শাহ্ ক্ষমতায় আসলেও মাত্র এক বছরের মধ্যে ১৭১৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি নিহত হন। নিয়ামত খাঁ তার দরবারেও ছিলেন বলে জানা যায়। এবং এই দুই মুঘল শাসকের দরবারে খেয়াল চর্চার একটি অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়েছিল বলেও জানা যায়।

ঙ. খেয়ালের উত্তরণে মুঘল সম্রাট মহম্মদ শাহ্ এর অবদান

মহম্মদ শাহ্ (রাজত্বকাল ১৭১৯-১৭৪৮ খ্রি:) ছিলেন একজন সংগীতানুরাগী শাসক একই সাথে দরবারে সংগীতচর্চার ক্ষেত্রে তিনি উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। জানা যায়, তিনি নিজেও সংগীতে পারদর্শী ছিলেন, সংগীত রচনাও করেছিলেন বিশেষ করে 'খেয়াল' ও 'তারানা'। উল্লেখ্য যে, তাঁর দরবারেও সংগীতজ্ঞ তানসেন বংশীয় নিয়ামত খাঁকে সভাসদ হিসেবে দেখতে পাওয়া যায়। অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন গুণী সংগীতজ্ঞ নিয়ামত খাঁ সংগীতের একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিলেন। সম্রাট মহম্মদ শাহ্ও তাঁর গুণের কদর করেছিলেন। তাঁকে উদার পৃষ্ঠপোষকতা দানের পাশাপাশি সংগীতের সম্মানসূচক 'সদারঙ্গ' উপাধি দিয়েছিলেন। খেয়ালরীতির একটি আলাদা মাত্রা দান করেন নিয়ামত খাঁ। খেয়ালরীতির প্রচলন পূর্বেও ছিল কিন্তু পূর্বে খেয়ালরীতি জনপ্রিয়তার শীর্ষে আরোহন করতে পারেনি। নিয়ামত খাঁ এই রীতির একটি উচ্চতর স্থানে পৌঁছে দেন। যা শ্রোতা সাধারণকে মুগ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিল। খেয়াল গানের উত্তরণের এ পর্যায়ে ধ্রুপদ গানের চর্চা হ্রাস পেতে শুরু করে। মূলত গায়ন বৈশিষ্ট্য যাই হোক না কেন শ্রোতা সাধারণের পছন্দের উপরই একটি গীত রীতির জনপ্রিয়তা নির্ভর করে। অর্থাৎ শ্রোতা যা পছন্দ করে সেটিই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। দীর্ঘদিন ধরে (প্রায় ৩০০ বছর) সংগীত জগতে ধ্রুপদ রীতির আধিপত্য ছিল। তবে আধিপত্য বিস্তার লাভ করে থাকা এই রীতি ধীরে ধীরে জনপ্রিয়তা হারাতে থাকে। কেননা ধ্রুপদ গায়নের ক্ষেত্রে নিয়ম রীতির প্রাবল্য ও কঠোরতা ছিল। একটি সময় শ্রোতা সাধারণকে যা হয়তো আর আকৃষ্ট করতো না। নিয়ামত খাঁ উদ্ভাবিত খেয়ালরীতি তাই খুব সহজেই সেই স্থান দখল করে নেয়। কয়েক শতাব্দী পূর্বে আমীর খসরু এবং পরবর্তীতে হোসেন শাহ্ শর্কী (১৪৫৮-১৪৯৯খ্রি:) খেয়ালরীতিকে একটি বিশিষ্টতা দানের ক্ষেত্রে কাজ করেছিলেন ঠিকই কিন্তু নিয়ামত খাঁ সদারঙ্গের ন্যায় তাঁরা খেয়ালরীতিতে সেই সৌকর্য সৃষ্টিতে সক্ষম হননি। তাছাড়া ধ্রুপদ পরিবেশন ব্যতিরেকে অন্য কোন গীতরীতি দরবারে পরিবেশন করা যাবে না এমন গোঁড়ানীতি তৎকালীন রাজদরবারে খেয়ালরীতির জনপ্রিয়তা না পাওয়ার একটি উল্লেখযোগ্য কারণ ছিল বলেও ধরে নেয়া যেতে পারে। আবার অন্যভাবে বলা যায় দিল্লীর দরবার ছিল তৎকালীন সংগীতের রাজধানী স্বরূপ। হুসেন শাহ্ শরকী দিল্লীর শাসক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন না। তিনি ছিলেন জৌনপুরের রাজা। তাঁর প্রবর্তিত খেয়ালরীতি দিল্লীর দরবারে প্রতিষ্ঠিত করে তা দরবারী সংগীতের মর্যাদায় আনয়ন যথেষ্টই কষ্টসাধ্য বিষয় ছিল। সে তুলনায় নিয়ামত খাঁ প্রবর্তিত খেয়াল রীতি দরবারী সংগীতের মর্যাদায় আনয়নে ততটাও বেগ পেতে হয় নি। কেননা তিনি দিল্লীর দরবারী সভাসদ ছিলেন। উল্লেখ্য যে, বাহাদুর শাহ্, বাহাদুর শাহ্র পুত্র জান্দাহার শাহ্ ও মহম্মদ শাহ্ এই তিনজন শাসকের দরবারেই নিয়ামত খাঁর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। শুধু তাই নয়, এ ঘটনার অনেক পূর্ব থেকেই অর্থাৎ সম্রাট শাহ্জাহানের সময় থেকেই খেয়াল রীতিসহ অন্যান্য গীতরীতি পরিবেশনের ক্ষেত্রে দিল্লীর দরবার শিথিল ছিল। সে দিক থেকে বিবেচনা করলে নিয়ামত খাঁ খেয়ালরীতির প্রবর্তনে একটি অনুকূল পরিবেশ পেয়েছিলেন বলা যেতে পারে।

নিয়ামত খাঁ সদারঙ্গ অসংখ্য খেয়াল গানের বন্দিশ রচনা করেছিলেন। তাঁর বন্দিশে 'সদারঙ্গ' ও বাদশাহের নাম 'মহম্মদ শাহ্ রঙ্গীলে' যুক্ত করে খেয়াল গান রচনা করেন। নিয়ামত খাঁ ছিলেন তানসেন কন্যাবংশীয় পরম্পরার যোগ্য উত্তরসুরী। নিয়ামত খাঁ রচিত গান ও পরিবেশন রীতি অবলম্বন করেই বর্তমানে প্রচলিত খেয়ালের ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে। এর ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে শিষ্য-প্রশিষ্য পরম্পরায় যাঁরা এই ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক হিসেবে এসেছেন তাদের মধ্যে পুত্র ফিরোজ খাঁ (অদারঙ্গ), ভূপত খাঁ (মহারঙ্গ) ও আমীর খাঁ ছিলেন উল্লেখযোগ্য। একথা স্পষ্ট করে বলা যায়, খেয়ালরীতিকে একটি বিশিষ্টতা দান করেছিলেন নিয়ামত খাঁ সদারঙ্গ একই সাথে খেয়াল গানের উত্তরণে অসামান্য ভূমিকা রেখেছিলেন মুঘল শাসক মুহম্মদ শাহ্। মহম্মদ শাহ্ এর খেয়াল গানের প্রচলনে পৃষ্টপোষকতা দান ও সংগীতের প্রতি উদার দৃষ্টিভঙ্গী খেয়ালরীতিকে একটি অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিল বললে তাই অত্যুক্তি হয় না।

চ. মুঘল শাসন পরবর্তী ইংরেজ শাসনামলে খেয়ালের চর্চা

অষ্টাদশ শতকে মুঘল শাসনের পতন ও ইংরেজ শাসনের উত্থানের ফলে সংগীতজগতে একটি বৃহদাকারের পরিবর্তন সাধিত হয়। সম্রাট মহম্মদ শাহ্ ক্ষমতাচ্যুত হন এবং ইংরেজরা দিল্লীর শাসন ভার গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, মুঘল শাসনামলে ভারতীয় সাংগীতিক ঐতিহ্যটি ছিল দিল্লীকেন্দ্রিক। ইংরেজদের ক্ষমতা দখলের পর দিল্লীর দরবারী সংগীতপ্রথা একেবারে বিলুপ্ত হয়ে পড়ে। এসময় দরবারী পৃষ্ঠপোষকতা হারানোর ফলে দিল্লীর দরবার এবং দিল্লীর নিকটবর্তী বেশকিছু অঞ্চল থেকে সংগীতজ্ঞরা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। ভারতের যেসব অঞ্চলে ইংরেজরা আধিপত্য বিস্তার করতে পারেনি সেসব অঞ্চলের শাসকগণ যাঁরা সংগীতের প্রতি উদার মনোভাবাপন্ন ছিলেন তাঁরা দিল্লীর দরবারচ্যুত সংগীতজ্ঞদের আশ্রয় দিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে জানা যায়:

> ভারতবর্ষে তৎকালীন নবাব ও রাজাদের যাবতীয় ক্ষমতা যখন ক্রমানুসারে ইংরেজরা প্রত্যাহার করে নেয়, সেই দুর্দিনেও রামপুর, জয়পুর, গোয়ালিয়র, বড়োদা প্রভৃতি রাজ্যের নামে মাত্র নবাব ও রাজারা তাঁদের সাধ্যমতো সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন।[১৪]

বিভিন্ন আঞ্চলিক রাজার আশ্রয় ছাড়াও অনেক সংগীতজ্ঞ নিজ উদ্যোগে কোন কোন অঞ্চলে অবস্থান করেছেন এবং সংগীতের চর্চা ও প্রসারের ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছেন। যা পরবর্তীতে ঘরানার রূপ নেয়। এরই ধারাবাহিকতায় ইংরেজ শাসনামলে দিল্লীর পার্শ্ববর্তী ও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের রাজদরবারে খেয়ালচর্চার প্রমান পাওয় যায়। তন্মধ্যে অন্যতম প্রসিদ্ধ অঞ্চল হলো গোয়ালিয়র। তোমর রাজবংশের সংগীতে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য গোয়ালিয়র অনেক আগে থেকেই প্রসিদ্ধ ছিল। পরবর্তীতে সেই ঐতিহ্য অনেক রাজধিরাজই রক্ষা করেছেন। উল্লেখ্য যে, ইংরেজ শাসন পরবর্তী গোয়ালিয়রের রাজা ছিলেন দৌলত রাও সিন্ধিয়া। তিনি সংগীতের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। তাঁর দরবারে সংগীতচর্চার একটি অনুকূল পরিবেশ রচিত হয়েছিল। সে সময় দরবারে বেশ কজন স্বনামধন্য সংগীতজ্ঞের পরিচয় পাওয়া যায় যাঁরা তৎকালীন গোয়ালিয়রের রাজ দরবার অলংকৃত করেছিল। যেমন: পীরবকস্, নথ্থু খাঁ, হদ্দু খাঁ, হস্সু থাঁ সুখখেন ও চিন্তামনি প্রমুখ বড় মাপের সংগীত শিল্পী। তন্মধ্যে একজন স্বনামধন্য খেয়ালীয়া ছিলেন বড়ে মহম্মদ খাঁ। বড়ে মহম্মদ খাঁ ছিলেন দিল্লীর কাব্বাল ঘরানার শক্কর খাঁর পুত্র। জানা যায় বড়ে মহম্মদ খাঁ-ই খেয়াল গীতরীতিতে আকার তানের সংযোজন করেন। এ সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায়:

> কাব্বাল ঘরের গীতরীতি অনুসারে বড়ে মহম্মদ খাঁ যখন দ্রুতলয়ে ফিক্রাবন্দীর প্রয়োগ করে খ্যাল গাইতেন তখন গানের বোলগুলি অস্পষ্ট হয়ে আকারের মতো হয়ে যেত। পরবর্তীকালে শুধু আকার যোগে উক্ত ক্রিয়াটির দ্বারা সবার চমক সৃষ্টি করতেন। এভাবে বড়ে মহম্মদ খাঁর শিল্পচেতনায় খ্যাল গানের বর্তমান তান ক্রিয়ার জন্ম হল আনুমানিক ১৮০০-১৮৩০ খ্রিষ্টব্দের মধ্যে।[১৫]

উপরোক্ত মত থেকে সহজেই অনুমান করা যায়, বর্তমান খেয়ালরীতির সামগ্রিক রূপ পরিগ্রহ করতে প্রায় ঊনবিংশ শতাব্দির মাঝামাঝি পর্যন্ত সময় অতিবাহিত হয়েছিল। একই সাথে বলা যায় তৎকালীন গোয়ালিয়র অধিপতি দৌলত রাও এর আনুকূল্যে খেয়ালরীতির এই রূপ পরিগ্রহ সম্পন্ন হয় যা রাগ সংগীতের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সে সময় গোয়ালিয়রের রাজার সংগীতে পৃষ্ঠপোষকতারও বেশকিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একটি ঘটনার চিত্র তুলে ধরা হলো:

> দৌলত রাওজির দরবারে তাঁর (বড়ে মহম্মদ খাঁ) মাসিক বেতন ছিল বারো শত টাকা। সেজন্য কোনও সময়ে মহামন্ত্রী ত্র্যম্বক রাও অন্যান্য সংগীতজ্ঞের তুলনায় বড়ে মহম্মদ খাঁকে বেতন অনেক বেশি দেওয়া হচ্ছে বিবেচনা করে ব্যয় সংকোচনের জন্য মাত্র তিনশত টাকা বেতন ধার্য করে মহারানী বাইজাবাঈ-এর অনুমোদন নিয়ে বিষয়টি লিখিতভাবে বড়ে মহম্মদ খাঁর এর কাছে পাঠিয়ে দেন। এত অল্প টাকায় খাঁ সাহেবের পক্ষে এখানে থাকা সম্ভব নয় তাই মহারাজকে জানিয়ে প্রণাম করতে গিয়ে তাঁকে পত্রটি দেখালেন। পত্র পড়ে বিরক্ত হয়ে মহামন্ত্রীকে ডেকে বলেছিলেন, অপর একজন বড়ে মহম্মদ খাঁকে এনে দিতে পারলে একে বিদায় দিতে পারো নতুবা বেশি টাকা দিয়েই রাখতে হবে। রাজার মন্তব্যে মহামন্ত্রী ত্র্যম্বক রাও তাঁর আদেশপত্র প্রত্যাহার করে নিলেন।[১৬]

এর থেকে সহজেই অনুমান করা যায় গোয়ালিয়র অধিপতি বড়ে মহম্মদ খাঁর গুরুত্ব অনুধাবন করেছিলেন। তিনি সংগীতের প্রকৃত সমঝদার ছিলেন বলেই পৃষ্ঠপোষকতার এরূপ নজির স্থাপন করেছিলেন। পরবর্তীতে গোয়ালিয়র সংগীতের তীর্থ ভূমিরূপে সংগীত জগতে স্থান করে নেয় যা বর্তমান সময় অবধি গোয়ালিয়র (খেয়াল) ঘরানা হিসেবে সর্বজন স্বীকৃত। গোয়ালিয়রের এই সংগীতজ্ঞ বড়ে মহম্মদ খাঁকে দেখা যায় রেওয়ার রাজা বিশ্বনাথ সিংহের দরবারেও। ঊনবিংশ শতাব্দির শেষার্ধে গোয়ালিয়র ঐতিহ্যের প্রভাব বাংলা অঞ্চলেও দেখতে পাওয়া যায়। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের আনুকূল্যে খেয়ালীয়া গোপালচন্দ্র এই রীতির প্রসারে অবদান রেখেছিলেন। গোপালচন্দ্র গোয়ালিয়র থেকেই খেয়ালে তালিমপ্রাপ্ত হন।[১৭] অন্যদিকে ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে বরোদা ও রামপুরেও (সহসবান ঘরানা) সংগীতের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হতে দেখা যায়। নবাব ইয়ুসুফ আলী (১৮৪০-১৮৬৪) খাঁ ছিলেন তৎকালীন একজন বিত্তশালী নবাব। জানা যায়: 'নবাব ইয়ুসুফ আলী অত্যন্ত সঙ্গীত প্রেমী ছিলেন এবং সংগীতজ্ঞদেও যথেষ্ট পোষকতা করতেন।'[১৮] তাঁর পুত্র নবাব কলবে আলী খাঁ (১৮৬৪-১৮৮৭) সেই ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছিলেন এবং পিতার তুলনায় অধিকতর সংগীতের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন বলে জানা যায়। দরবারে তৎকালীন খেয়ালীয়া হসসু খাঁ ও হদ্দু খাঁকে রামপুরের দরবার অলংকৃত করতে দেখা যায়। এই দরবারে খেয়ালের যথেষ্ট চর্চা একটি অনুকূল ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছিল এবং তৎকালীন আঞ্চলিক রাজাদের উদার পৃষ্ঠপোষকতায় তা অনন্য উচ্চতায় আসীন হয়েছিল।

এ প্রসঙ্গে অযোধ্যার (লখনৌ) শেষ নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ্ (১৮২২-১৮৮৭) এর অবদানও উল্লেখ করার মতো। তিনি 'সংগীতজ্ঞ, গায়ক, গীত রচয়িতা, যন্ত্রী, নৃত্যবিদ ও সংগীতের অকুণ্ঠ পৃষ্ঠপোষক রূপে স্মরণীয় হয়ে আছেন।...ওয়াজেদ আলী শাহ্ এর তৎকালীন লখনৌ এর দরবার ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগীত কেন্দ্রে পরিণত হয়।'[১৯] তিনি মূলত ঠুমরী গানের প্রবক্তা ছিলেন তথাপি তৎকালে খেয়ালের চর্চায় তার দরবার অনন্য বিশিষ্টতা লাভ করেছিল। তাঁর দরবারে ছিল

বিখ্যাত খেয়াল গায়ক সাদিক আলি খাঁ। যদিও তিনি পরবর্তীতে ওয়াজেদ আলী শাহ্ এর নিকট তালিম গ্রহণ করে ঠুমরী গানে পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন। ১৮৫৮ সালে নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ্ লখনৌ এর দরবার থেকে নির্বাসিত হন এবং জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু করেন মেটিয়াবুরুজে। মেটিয়াবুরুজেও তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় দরবারী সংগীতের সূচনা হয়। এই দরবারে তৎকালীন প্রায় দেড়শ সংগীতজ্ঞের (বিভিন্ন বিষয়ের) নাম জানা যায়।[২০] তন্মধ্যে অনেকেই খেয়ালের চর্চা ও প্রসারে অবদান রেখেছিলেন।

উপসংহার

ভারতীয় উপমহাদেশে সংগীতের প্রভূতি উন্নতি সাধনের পেছনে এ উপমহাদেশের রাজন্যবর্গের বিশেষ করে মধ্যযুগে সুলতানী ও মুঘল শাসকদের বিশেষ অবদান ছিল। সুলতানী ও মুঘলদের মধ্যে অধিকাংশ শাসকই সংগীত পছন্দ করতেন এবং সংগীতের উন্নতির ক্ষেত্রে উদার পৃষ্ঠপোষকতা দান করেছিলেন। এর একটি বিশেষ কারণ ছিল উচ্চমার্গীয় শিল্প হিসেবে সংগীতে গ্রহণযোগ্যতা একই সাথে শাসকশ্রেণির উদারতা। খেয়াল গীতশৈলীটিও একটি অনন্য সংগীতের ধারা হিসেবে বিবেচিত ও স্বর্বজন স্বীকৃতি। তবে খেয়ালের এই অনন্য উচ্চতায় আরোহন করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে, দরবারে এই গীতশৈলীকে একটি মর্যাদায় আসীন হতে যথেষ্ট সময় অতিক্রম করতে হয়েছে। তৎকালীন রাজন্যবর্গের সুদৃষ্টি এক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল বলেই খেয়ালশৈলী মর্যাদা প্রাপ্ত হয়েছে তা স্পষ্ট করে বলা যেতে পারে। রাজন্যবর্গ ও তৎকালীন সংগীতের যারা দিকপাল ছিলেন তাঁদের অবদান খেয়ালের উত্তোরণের ক্ষেত্রে বিশেষ উপযোগী হয়েছিল তা সুস্পষ্টভাবেই বলা যায়। খেয়ালের উত্তরোণে যেমন রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা একটি ইতিবাচক দিক হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল তেমনি বর্তমান বাংলাদেশে সংগীত শিক্ষা, চর্চা ও প্রসারের ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। বাংলাদেশে সংগীতচর্চার ক্ষেত্রটি প্রসারিত হতে পারে এবং কর্মসংস্থান তৈরীর ক্ষেত্রে একটি বিশেষ দিকের উন্মোচন হতে পারে যদি সংগীত ক্ষেত্রে সরকারী ও বেসরকারীভাবে পৃষ্ঠপোষকতা বৃদ্ধি করা যায়। এক্ষেত্রে Issues Around Pedagogy: Teaching-Learning Strategies in Arts and Humanities for the 21st Century-এর সাথে উপরোক্ত গবেষণার একটি প্রাসঙ্গিকতা রচিত হয়।

তথ্য নির্দেশ

১ প্রভাতকুমার গোস্বামী, *ভারতীয় সংগীতের কথা* (পরিবর্ধিক ষষ্ঠ সং.; কলকাতা: আদি নাথ ব্রাদার্স, ২০১১), পৃ. ১১৩

২ প্রভাতকুমার গোস্বামী, পৃ. ১১৩

৩ প্রভাতকুমার গোস্বামী, পৃ. ১১৩

৪ প্রভাতকুমার গোস্বামী, পৃ. ১১৩

৫ ড. প্রদীপ কুমার ঘোষ, *সংগীত শাস্ত্র সমীক্ষা* [দ্বিতীয় পর্ব] (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমী, ২০০৫) পৃ.২৭

৬ উৎপলা গোস্বামী, *ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীত* (২য় সং.;কলকাতা: দীপায়ন, ১৪০৫ব.), পৃ.১৫৫

৭ উৎপলা গোস্বামী, পৃ. ১৫৫

৮ ড. প্রদীপ কুমার ঘোষ, পৃ.২৯

৯ উৎপলা গোস্বামী, পৃ. ১৫৬ (পাদটিকা হিসেবে প্রাপ্ত)

১০ করুনাময় গোস্বামী, *বাংলা গানের কথা* (চট্টগ্রাম শিশু সাহিত্য বিতান, বৈশাখ ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ), পৃ. ২০

১১ বিনয় চক্রবর্তী, *দরবারে সংগীতজ্ঞ*, ড. প্রদীপ কুমার ঘোস (সম্পা.), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যসংগীত আকাদেমী পত্রিকা,ষষ্ঠ সংখ্যা (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যসংগীত আকাদেমী, মার্চ ২০০৪), পৃ. ৪৪।

১২ বিনয় চক্রবর্তী, পৃ. ৪৪

১৩ ম. ন. মুস্তফা, *আমাদের সংগীত ইতিহাসের আলোকে* (ঢাকা: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, জানুয়ারী ১৯৮১), পৃ. ১৬৮

১৪ অমল দাশ শর্মা, *প্রাচীন ও নবীন সংগীতজ্ঞ এবং ঘরানার ইতিবৃত্ত* (কলকাতা: দরবার প্রকাশন, ১৯৯৫), পৃ. ২০৪

১৫ বিনয় চক্রবর্তী, পৃ. ৫৫

১৬ তদেব, পৃ. ৫৫

১৭ দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, ভারতীয় সংগীতে ঘরানার ইতিবৃত্ত (কলিকাতা: মুখার্জী এন্ড কোং প্রা:লি:, জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৪ ব.), পৃ.২২

১৮ অমল দাশ শর্মা, পৃ. ২০৩

১৯ করুনাময় গোস্বামী, *সংগীতকোষ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, জুন ২০০৪), পৃ. ৬০

২০ করুনাময় গোস্বামী, পৃ. ৬০